ছবি: রাজীব দে

আমি কলকাতার বাঙালি ইংরেজ বাঙালি নই

দক্ষিণ কলকাতার যে বহুতলে লেখক কুণাল বসু থাকেন, তার সামনেই ঝাঁকালো কাঠবাদামের গাছ আছে একটা। ফ্ল্যাটের বুকিংয়ের সময় প্রোমোটারকে পইপই করে বলে দিয়েছিলেন, বাড়ি বানানোর ছুতোয় এ গাছ কেটে ফেললে ফ্ল্যাট আর কিনবেন না। চাকরির সুবাদে অক্সফোর্ড আর কলকাতা— দুই গোলার্ধের দুই শহরে আধাআধি করে বছর কাটান। ইংল্যান্ডে নাকি ধুমধাড়াক্কা সজীব কোনও গাছ কাটা যায়ই না। ছবি তোলার অনুরোধে সাড়া দিয়ে আবাসনের সুউচ্চ ছাদে উঠতে উঠতে তাঁর আক্ষেপ, "কলকাতার কী যে হল! এত ভাল ছাদে আমি ছাড়া আর কেউ আসেই না।" লেখকের সঙ্গী ভাস্কর লেট

চলতি দফায় শহরে কতদিন থাকা হল?

অনেক দিনই হল। এসেছি গত বছরের নভেম্বরের গোড়ায়। ফিরব মে মাসের শেষে। আমার প্রথম ক্লাস ১৭ জুন। সুতরাং তার আগে গিয়ে লাভ নেই। (হাসি)

তার মানে ভোট দেওয়া হচ্ছে, ভোটের ফলও জেনেই ফিরতে পারছেন ইংল্যান্ডে?

হ্যাঁ। ভোটের রেজাল্ট তো চলে আসবে ২৩ মে।

আক্ষরিক অর্থেই আপনার জীবন বিছিয়ে আছে দুই গোলার্ধের পথে পথে। একদিকে কলকাতা, অন্যদিকে অক্সফোর্ড। বছরের মাসছয়েক মতো আপনি পূর্ব গোলার্ধে থাকেন। আর বাকি সময় কাটান পশ্চিমে। এই দোলাচল জীবনের সূত্রপাত কী করে ঘটল? যাপনটাই বা কেমন করে চলছে?

সূত্রপাতের কারণ খুব মামুলি— চাকরি। আমেরিকায় মাস্টার্স ও পিএইচডি করেছি। মাস্টারি করতে চেয়েছিলাম। সেই মাস্টারিই করছি। প্রথম জীবনে মন্ট্রিয়েলের ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটিতে। খুবই কসমোপলিটন শহর। গান, কবিতা, সাহিত্য। ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার চমৎকার মেলবন্ধন ঘটেছে সেখানে। তখনও কলকাতায় আসতাম। তবে বিভিন্ন কারণে কলকাতা থেকে আমার অভিমুখ কিছুটা ঘুরে গিয়েছিল। এটা আটের দশকের ব্যবহার পাল্টে গিয়েছিল।

এটাকেই কি 'রাজনৈতিক কারণ' বলছেন?

হ্যাঁ। দেখুন, লুকোছাপার ব্যাপার নেই। বামপন্থী পরিবারে আমার জন্ম। বামপন্থী রাজনীতির আঁচেই আমার বড় হওয়া। আমার বাবা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভ্যদের একজন। লেখিকা মা 'আইপিটিএ'-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মানবীবিদ্যা ডিসকোর্সের উপর বই লিখেছেন। বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক এঁরা আমাদের বাড়িতে আসতেন। ফলে যে আবহে আমার বেড়ে ওঠা সেটা যখন আস্তে আস্তে বদলে যেতে লাগল, আমারও কলকাতায় আসা কমে গেল। আসতাম, ওই যে বললাম, শুধুমাত্র মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু লেখার জগতে আসার পর কলকাতার সঙ্গে আমার অন্য এক ধরনের সম্পর্ক শুরু হল। এটা যে হবে, ঠিক আশা করিনি। কলকাতার পাঠকরা আষ্টেপৃষ্ঠে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

আপনার প্রথম উপন্যাস 'দ্য ওপিয়াম ক্লার্ক' বেরিয়েছে ২০০১ সালে। এর প্রস্তুতিপর্বটা কেমন ছিল?

আমি চিরকালই ভেবেছিলাম, লেখালিখি করব। কিন্তু জীবন ও জীবিকা আমাকে ভুল পথে চালিত করেছে (হাসি)। আমি মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলে। বেকার হয়ে বসে থাকা কখনওই কাম্য বয়সে ভাল সেন্স অফ জাজমেন্ট থাকে না। সকলে বলতে শুরু করল, তোর সায়েন্স নিয়েই উচ্চশিক্ষা করা উচিত। আমিও তাই চলে গেলাম যাদবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। খুব ইচ্ছা ছিল, কলাভবনে পড়া। সেটা হয়নি। পারিবারিক সামর্থ্য ছিল না। আর, আমাদের এখানে 'কেরিয়ার' মানে আপনি যদি একবার ট্রেনে উঠে পড়েন, তাহলে ট্রেন গন্তব্যে না পৌঁছনো অবধি নামতে পারবেন না। আমাকেও আমার ট্রেন নিয়ে গেল আমেরিকায়, মাস্টার্স করতে। স্কলারশিপ পেয়েছিলাম। পেয়ে ভাবলাম, বাঃ, ভাল মজা তো! নিজের টাকায় তো কখনও পৃথিবী ঘুরতে পারব না। অন্যের টাকায় পৃথিবী ঘোরার এর চেয়ে বড় সুযোগ হয়তো আর পাব না। বিনিময়ে একটা ডিগ্রি না হয় করে নেব! মনে রাখবেন, এটা কিন্তু ভুল

> ঠিক করেছিলাম, যদি দস্তুরমতো 'লেখক' হতে না পারি, তাহলে আমার বাড়ির সব বই আমি জানালা দিয়ে ফেলে দেব। কারণ সেগুলো চোখের সামনে থাকলে আমার অস্বস্তি হতে থাকবে

হ্যাঁ। তাও বটে। তবে এখানে অন্য একটা 'লেখক' হতে না পারি, তাহলে আমার বাড়ির সব বই আমি জানালা দিয়ে ফেলে দেব। কারণ সেগুলো চোখের সামনে থাকলে আমার অস্বস্তি হতে থাকবে।

কিন্তু কী করে একটানা লেখার জন্য সময় বের করব? তখন আমি ভাবতে শুরু করলাম, এমন কী কোনও পেশা আছে যা লেখার পক্ষে সবচেয়ে সহনীয়, লিস্ট ডেস্ট্রাক্টিভ। যেটা আমাকে লিখতে দেবে। আমি যদি কর্পোরেট জগতে ঢুকে যাই, তবে তো হবে না। সরকারি চাকরি করলেও মুশকিলের।

সাংবাদিকতার পেশায় গেলেও কি মুশকিল হত না?

তেমন নয়। এম. জে. আকবরের কাছে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেয়েছিলাম একটা বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিকে। উনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আপনি কেন সাংবাদিকতায় আসতে চান? আমি বলেছিলাম, দেশে ভাল ইঞ্জিনিয়ারের অভাব নেই, কিন্তু ভাল সাংবাদিকের অভাব আছে।

সে চাকরি করলেন না কেন?

ওই যে, মাস্টার্স করার স্কলারশিপ পেলাম! বুঝতেই পারছেন আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কারও 'কেরিয়ার' গড়া উচিত নয়। আসলে চেয়েছিলাম এমন একটা জায়গায় উপনীত হতে, যেখানে আমি শুধুই লিখতে পারব, এবং আমার জীবিকা কোনওভাবেই আমার লেখাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে না।

তাহলে অধ্যাপনাই আপনার মতে সেই 'লিস্ট ডেস্ট্রাক্টিভ' চাকরি যা লেখালিখির পথে অন্তরায় নয়?

একদমই তাই। যারা ভাগ্যবান, যাদের চাকরিবাকরি করার দরকার নেই, তাদের কথা আলাদা। কিন্তু চাকরি যাদের করতেই হবে, এবং যাদের আমার মতো লেখক হওয়ার বাতিক, তাদের জন্য আজ অবধি পৃথিবীতে একটিই চাকরি আছে: অধ্যাপনা। তবে যে কোনও জায়গায় অধ্যাপনা নয়। আমি অল্পদিনের জন্য হলেও কলকাতায় অধ্যাপনা

তাহলে আপনিই আপনার বস্। এটা ভেবে ও বুঝে, আমি সেভাবেই এগিয়েছি। বিদেশের টপ ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছি। প্রথমে ম্যাকগিল, পরে অক্সফোর্ড। ম্যাকগিলে ছিলাম ১৩ বছর। আর টেনিয়র পাওয়া প্রফেসরের সুবিধা হল আমার ডিন আমার বস্ নন। একশোর উপর পেপার লিখেছি ম্যানেজমেন্টে। রিসার্চ ইউনিভার্সিটির বিশেষ সুবিধা হল, যেদিন আপনার ক্লাস, আপনাকে সেদিন যেতে হবে ক্লাস নিতে। আর যে বিষয়ে গবেষণা করছেন, তা চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু এর বাইরে ইউ আর নট আনসারেবল টু এনিবডি।

আপনি দুই গোলার্ধেই পড়িয়েছেন। একদিকে ম্যাকগিল ও অক্সফোর্ড। অন্যদিকে, এখানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও আইআইএম কলকাতা। আসল তফাতের জায়গাটি কী?

আমি যাদবপুরে পড়িয়েছিলাম এক বছর মতো। আইআইএমে দেড় বছর। সেও অনেক দিন হতে চলল। এখন নিশ্চয়ই অবস্থার অনেকটা বদল হয়েছে। 'তফাত' বলতে এটাই বলতে পারি যে, আমার মনে হয়েছিল যে কারণে অধ্যাপনার চাকরি বেছে নিলাম, সেই লেখার জন্যই আমি সময় বের করতে পারছি না। ক্লাসের সংখ্যা প্রচুর। মিটিং, খাতা দেখা, চলতেই থাকছিল।

বিলেতে আপনাকে তখন ক'টা ক্লাস নিতে হত যখন আপনার প্রথম উপন্যাস বের হল?

শেষ দিকের কথা বলছি। মূলত মায়ের সঙ্গে দেখা করতেই আসতাম। কিন্তু আলাদা করে কলকাতা শহরটাকে আমার ভাল লাগত না তখন। ভাল না লাগার মধ্যে রাজনৈতিক কারণও ছিল। আমি যে কলকাতায় বড় হয়েছিলাম, সেই সাতের দশকের কলকাতা ছিল সৃষ্টির বিস্ফোরণে উজ্জ্বল। ’৭৭ সালের পর থেকে কলকাতা একটা অদ্ভুত শৈবালদামের মধ্যে আটকে পড়ল। চরিত্রগুলি হয়তো একই, কিন্তু তাদের ছিল না। চাকরি করতেই হত। আমার একটা সমস্যা ছিল। সেটা হল আমি খুব ভাল ছাত্র ছিলাম। যেসব সাবজেক্ট পড়তে একদম ভাল লাগত না, দেখা যেত আমি সেগুলোতেও ভাল নম্বর স্কোর করছি। এটা কিন্তু ভীষণ মুশকিলের জিনিস। আমার বরাবরের আগ্রহ সাহিত্য ও শিল্পকলায়। ইতিহাসে। এদিকে, আমি উচ্চ মাধ্যমিকে সায়েন্স নিয়ে পড়ে র‌্যাঙ্ক করে ফেললাম। এর থেকেই বোঝা যায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কী হাল! (হাসি) অত কম লাজিক। সম্পূর্ণ ভুল লাজিক।

লেখালিখি করার স্বপ্ন কি তখনও দেখতেন?
হ্যাঁ। ‘লিখব’, ‘আমাকে লিখতেই হবে’ এটা সব সময় আমার মাথায় গাঁথা ছিল। বুঝতে পারতাম, এই স্কলারশিপ বা ডিগ্রি নেওয়া আমার প্রকৃত লক্ষ্য নয়। ‘লেখক’ হতে চাইতাম। তবে আমি কখনও ‘সানডে রাইটার’ হতে চাইনি। ন’মাসে ছ’মাসের লেখক হতে চাইনি। ঠিক করেছিলাম, যদি দস্তুরমতো কথাও বলব। সমারসেট মম একবার বলেছিলেন, সাংবাদিকরা এসে সাহিত্যিকের বাজার খাচ্ছে। তার কারণ হল, মানুষকে জানতে হলে একজন সাহিত্যিককে প্রচুর কাঠখড় পোড়াতে হয়। কিন্তু পেশার প্রয়োজনেই একজন সাংবাদিক রোজ অনেক ধরনের মানুষকে মিট করছে। বিদেশের বহু নামী লেখকই সাংবাদিক। যেমন ধরুন, গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস। সাংবাদিকতার ব্যাপারটা যে আমার মাথায় তখন ঢোকেনি করেছি। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি আর আইআইএমে পড়িয়েছি। আমি জানি এদেশের অধ্যাপকদের অবস্থা। তাদের সপ্তাহে ডজনখানেক ক্লাস নিতে হত। তার উপর পরীক্ষার খাতা, নানারকম মিটিং। সে লোকটি লিখতে চাইলেও লিখবে কখন? কিন্তু যদি আপনি বিদেশে একটা মেজর রিসার্চ বেসড ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি করেন, এবং যদি সেখানে আপনি আপনার পাবলিকেশনের জোরে ‘টেনিয়র’ মানে পাকা চাকরি পান, ‘দ্য ওপিয়াম ক্লার্ক’ আমি লিখেছিলাম ম্যাকগিলে থাকতে থাকতেই। তখন সপ্তাহে দুটো করে ক্লাস। তিন-তিন ছ’ঘণ্টার। তার মানে কি বাকিটা সময় আমি ফ্রি? না, তা নয়। দুটো ক্লাস করাচ্ছি আমি, মানে ধরে নেওয়া হচ্ছে, দুটো ক্লাসের বরাদ্দ সময় বাদ দিয়ে আমি অন্য সময় জুড়ে গবেষণা করব।

নয়ের পাতায়

Copyright © 2019 Pratidin Prakashani Pvt Ltd. All rights reserved

...ইংরেজ বাঙালি নই

আটের পাতার পর

কারণ টেনিয়র্ড প্রফেসরের কাজের ক্ষেত্রে তার নিজের গবেষণা বিরাট গুরুত্বের ব্যাপার। নির্ধারিত সময়ের পরে সেই গবেষণাপত্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠিয়ে মত জানতে চাওয়া হবে যে এই ব্যক্তি বরাবরের জন্য ওই রিসার্চ বেসড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারবে কি না। ম্যাকগিলে যখন টেনিয়র করে ফেললাম, তখন বুঝতে পারলাম যে আমার জীবিকার সমাধান আমি করে ফেলেছি। এবার আমার না লেখার আর কোনও কারণ থাকতে পারে না।

এখন ক'টা ক্লাস নিতে হয় অক্সফোর্ডে?

এখন বছরে চোদ্দোটা ক্লাস। অনেক কম।

প্রথম উপন্যাস লেখার সময় ডেলি রুটিন কেমন ছিল?

আমি দিনে দশ থেকে বারো ঘণ্টা ডেস্কে কাটাই। গত কুড়ি বছর এটাই আমার রুটিন। দেরি করে শুতে যাই। একটু দেরিতেই উঠি। এখন অবশ্য খুব দেরি হয় না। তবু সেই সময় সকাল সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে ডেস্কে বসে যেতাম। মাঝে মাঝে আমার স্ত্রী আমাকে জোর করে বাইরে হাঁটতে পাঠাত। হয়তো আধ ঘণ্টা হেঁটে এলাম। বা চা বানিয়ে খেলাম। একটু বিরতি নিয়ে আবার ডেস্কে। লেখার মাঝেই লেখার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র পড়তাম।

আচ্ছা, প্রথম উপন্যাসের পটভূমি বা বিষয় হিসাবে আপনি হঠাৎ ইতিহাসকে বাছলেন কেন?

ইতিহাস ভালবাসা একটা বড় কারণ। যেখানেই যাই, ইতিহাসের গন্ধ পাই। ক'দিন আগে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম একটা টক দিতে। গিয়েই মনে হল, এটা তো কল্যাণী নয়, আসলে এটা 'রুজভেল্ট টাউন'। বিধানবাবু সে নাম বদলে 'কল্যাণী' করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রুজভেল্ট টাউন মার্কিন বন্দারদের আস্তানা ছিল। কেমন হয় এই রুজভেল্ট টাউন নিয়ে উপন্যাস লিখলে? লিখিনি। কিন্তু বলার যেটা চেষ্টা করছি, ইতিহাসের উপর সব সময় টান অনুভব করি। ইতিহাস নিয়ে পড়া হয়নি, এটা দুর্ভাগ্য।

এবার কথা হচ্ছে, 'দ্য ওপিয়াম ক্লার্ক' উপন্যাসের স্টোরিটা কী করে পেলাম? আমি আগে একটা গল্প খুঁজি। সেই গল্প থেকেই ইতিহাসের আশ্রয়ে যাই। আমি ও আমার স্ত্রী খুব বেড়াতে ভালবাসি। '৯৬ সালে একবার সুস্মিতাকে নিয়ে ট্রেক করতে গিয়েছি থাইল্যান্ড, লাওস ও বার্মার বর্ডারে। যেটাকে 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল' বলা হয়। খুব কুখ্যাত অঞ্চল। আফিম চাষের জন্য বিখ্যাত। সন্ধেগুলো ছিল ভীষণ বোরিং। হোটেলের ঘরে বসে থাকা। সকালে আবার ট্রেক করব। একদিন আমার গাইড একটা বই দিয়ে বলল, বসেই যখন আছ পড়ে দেখো না! বইটি ছিল গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল ও হেরোইন ট্রাফিকিংয়ের উপর। এই বিষয়টা নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ ছিল না। কিন্তু বোর হচ্ছিলাম। তাই পাতা উল্টোতে লাগলাম। তারপর এক জায়গায় একটা বিশেষ লাইনে নজর আটকে গেল: 'ইন দ্য নাইন্টিনথ সেঞ্চুরি দ্য ক্যাপিটাল অফ ওয়ার্ল্ড ড্রাগ ট্রেড ওয়াজ ক্যালকাটা'। আমি বারবার পড়ি লাইনটা, আর ভাবতে থাকি, এটা কী করে হতে পারে? আমি খোদ কলকাতার ছেলে। আমার বাপ-ঠাকুরদা কলকাতার। এ শহরে আমার জন্ম, বড় হওয়া, পড়াশোনা। কই, কেউ তো আমাকে এটা শেখায়নি? ঠিক করলাম, বিষয়টা সত্যি কি না তা যাচাই করে দেখতে হবে। ততক্ষণে বুঝতেই পারছেন বিষয়টা আমাকে সম্মোহনে ফেলে দিয়েছে। আমি ফিরে এলাম ট্রেক করে।

এখনও সেই দিনটা চোখের সামনে দেখতে পাই। সোশ্যাল সায়েন্স লাইব্রেরিতে ঢুকে কার্ড ইনডেক্স দেখে দেখে ওপিয়াম ট্রেডের উপর চার-পাঁচটা বই নামিয়েছি। যত পড়ছি, পুরো উপন্যাসটা আমার চোখের সামনে আস্তে আস্তে উন্মীলিত হচ্ছে। কী অসাধারণ বিষয়! তারপরেই উপন্যাসের প্রোটাগনিস্ট হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্তী এসে গেল আমার কল্পনায়। সে জানবাজারের ছেলে, আলিপুরের আফিমের দফতরের কেরানি। জানেও না, কত বড় চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সে শুধু আয়-ব্যয়ের হিসাব কষে। 'দ্য ওপিয়াম ক্লার্ক'-এর জন্য প্রচুর পড়তে হয়েছে। গবেষণা করতে হয়েছে। মেডিকেল লাইব্রেরিতে গিয়ে আমি জানতে চাইতাম, আফিম খেলে কী এফেক্ট হয়? কী ক্ষতি হয়? (হাসি)

তার মানে উনিশ শতকে কলকাতাই ছিল নেশাবস্তুর স্বর্গরাজ্য?

হ্যাঁ। সাহেবদের বুদ্ধি তো সাংঘাতিক। ওরা দেখল, ওরা চিনাদের থেকে অনেক কিছু কিনছে। চা, সিল্ক, পোর্সেলিন। কিন্তু চিনারা কিছু কিনছে না। ফলে ব্যালেন্স অফ ট্রেডে মার খেয়ে যাচ্ছে। এমন কী জিনিস আছে যা চিনারা কিনবেই কিনবে? আফিমের ব্যবসা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আসলে পর্তুগিজরা শুরু করেছিল। ব্রিটিশরা স্পট করে যে, এই জিনিসটার বাণিজ্য যদি শুরু করা যায়, তাহলে চিনারা তা কিনতে বাধ্য হবে। একবার ব্যবসা জমে গেলে চিনাদের কাছে আফিমের নেশা হয়ে উঠবে অপ্রতিরোধ্য। এই করে সাহেবরা একটা পুরো জাতকে নেশার জালে আচ্ছন্ন করে দিল। আফিমকে বলা হত 'বেঙ্গল মাড'। যদিও বেঙ্গলে এর চাষ হত না। হত উত্তরপ্রদেশ আর বিহারে। বজরা করে গঙ্গা বেয়ে আসত। তারপর অকশন হত। আফিম যে কী জিনিস, তা সাহেবরা বিলক্ষণ জানত, তাই ভারতে সেভাবে এই নেশাটাকে ছড়াতে চায়নি।

আপনি কলকাতার বাঙালি। কলকাতায় আপনার বড় হওয়া। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে স্বচ্ছন্দ। কিন্তু আপনি প্রথম উপন্যাস লিখলেন ইংরেজি ভাষায়। কেন?

অত্যন্ত সংগত প্রশ্ন। আমি কলকাতার বাঙালি। ইংরেজ বাঙালি নই। তবু যে আমার প্রথম উপন্যাস লেখা হল ইংরেজিতে, এর কারণ, আফিমের গল্প মানেই সাম্রাজ্যবাদের গল্প। গল্পটা যখন আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে, তখন যে সংলাপ ও শব্দের রেশ আমার মনে ঢেউ তুলেছিল, তা ছিল ইংরেজি-ঘেঁষা। আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম কলকাতার অকশন হাউসে সাহেবদের সংলাপ, অফিসে নিজেদের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে নেটিভ কেরানিদের দেওয়া হুকুম— সবটাই ইংরেজিতে। পুরো বাতাবরণে ইংরেজির রেশ। তা ছাড়া, এই উপন্যাসের গল্পের ঢেউ ও ঘটনাপ্রবাহ কলকাতা ছাড়াও ক্যান্টন অর্থাৎ চিন এবং মালয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানেও আমি এই কলোনিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ শুনতে পেলাম। পৃথিবীর নানা অঞ্চলকে জুড়ে ফেলেছিল যে ইংরেজ সাম্রাজ্য, সেই জোড়ার কাজে ইংরেজি ভাষাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আফিম সাম্রাজ্যের গল্প বলার জন্য ইংরেজি ভাষাটা যেই আমার মনে আনাগোনা করতে শুরু করল, ঠিক করলাম এটা ইংরেজিতেই লিখব। এই ব্যাপারটা আমার বাংলায় লেখা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও হয়েছে। আমি যখন 'রবি-শংকর' লিখি, বাংলায় আমার প্রথম উপন্যাস, তখনও আমি পুরো উপন্যাসের সংলাপ ও শব্দের রেশে বাংলা-ঘেঁষা জগতের হদিশ পেয়েছিলাম।

(দ্বিতীয় ও শেষ অংশ বৃহস্পতিবারের কফিহাউসে)

আমার প্রথম উপন্যাস লেখা হল ইংরেজিতে, এর কারণ, আফিমের গল্প মানেই সাম্রাজ্যবাদের গল্প। গল্পটা যখন আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হচ্ছে, তখন যে সংলাপ ও শব্দের রেশ আমার মনে ঢেউ তুলেছিল, তা ছিল ইংরেজি-ঘেঁষা। আমি যেন শুনতে পাচ্ছিলাম কলকাতার অকশন হাউসে সাহেবদের সংলাপ, অফিসে নিজেদের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে নেটিভ কেরানিদের দেওয়া হুকুম— সবটাই ইংরেজিতে

Copyright © 2019 Pratidin Prakashani Pvt Ltd. All rights reserved